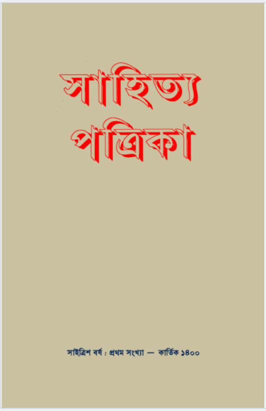

Vol. 37 | No. 1 | 1993

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কবি নজরুলের সংস্কৃত ছন্দে গান

Volume	37
Issue	1
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	অমলকুমার মিত্র
Published online	October 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v37i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v37i1.4
Pages	85-95
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৭ : সংখ্যা ১

Check for updates

কবি নজরুলের সংস্কৃত ছন্দে গান

অমলকুমার মিত্র *

কবি নজরুল ইসলাম সংস্কৃত ছন্দ অবলম্বনে কিছু গান রচনা করেছিলেন। বাংলা গানে সংস্কৃত ছন্দের প্রভাব চর্যাগীতির কাল থেকেই সূচিত। নজরুল ইসলাম এই ধারাবাহিকতার একজন সার্থক স্রষ্টা। বর্তমান আলোচনায় নজরুল নির্বাচিত সংস্কৃত ছন্দের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

* পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ

নজরুল সংগীত পরিক্রমায় দেখা যায় যে কবি নজরুল ইসলাম সংস্কৃত ছন্দ অবলম্বনে দশটি সংগীত রচনা করেছিলেন। ওই গানগুলি কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে 'ছন্দিতা' নামে দুটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল ১৯৪১ সালের ২৬ জুলাই। রচনা ও পরিচালনায় ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, বর্ণনায় সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, যন্ত্রানুষঙ্গে যন্ত্রীসংঘ এবং ভূমিকায় ছিলেন শৈল দেবী, ইলা ঘোষ ও চিত্তরঞ্জন রায়। এর ১৭ বছর পরে গানগুলি কবির *শেষ সওগাত* গ্রন্থে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় মুদ্রিত হয়েছিল। সংস্কৃত ছন্দগুলির নাম এবং সেগুলির সূত্রে কবির গানের প্রথম চরণ নিচে উল্লেখ করা হলো :

সংস্কৃত ছন্দের নাম			কবির গানের কথা
প্রিয়া	...	...	মহুয়া বনে বন পাপিয়া
মধুমতী	...	...	বনকুসুম তনু তুমি কি মধুমতী
দীপকমালা	...	...	দীপকমালা গাঁথ গাঁথ সই
স্বাগতা	...	...	স্বাগতা কনক চম্পকা বর্ণা
মন্দাকিনী	..	...	জল ছলছল এস মন্দাকিনী
মণিমালা	..	...	মধু মধু ছন্দা নিত্যা তব সঙ্গী
রুচিরা	...	...	ভ্রমর নূপুর পরিহিতা কৃষ্ণ কুন্তলা
মধুভাষিণী	...	...	আজো ফাল্গুনে বকুল কিংশুকের বনে
মত্তময়ুর	...	...	মত্তময়ুর ছন্দে নাচে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে
চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত	...	...	তারকা নূপুরে নীল নভে

এই বিষয়টি সম্পর্কে প্রচারিত অদ্ভুত রকম ভুল-ভ্রান্তি বর্তমানে অতিকায় রূপ ধারণ করেছে। এই অবস্থায় সংস্কৃত ছন্দের কিঞ্চিৎ প্রাথমিক ধারণাসহ বিষয়টি আলোচনা করার জরুরী প্রয়োজন রয়েছে।

এছাড়া বিষয়টির আরেক গুরুত্বপূর্ণ দিকও আছে।

শুধু নজরুলই নন, যে কোনো সংগীতকারেরই গান বাঁধার কিছু স্বাভাবিক প্রক্রিয়া আছে। স্রষ্টা হয় কোনো সুরের চাল অবলম্বনে গীতিকবিতার অবয়ব গঠন করেন অথবা এক একটি ভাবের বশে গীতিকবিতা রচনার পর সুরারোপ করেন। কোনো কোনো গানের কথা ও সুর একই সাথে স্রষ্টার মনে এসে পড়ে। গান বাঁধার এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় গানের রূপটি অভ্যস্ত সংস্কারের প্রভাবে কোনো না কোনো প্রচলিত তালের ভাঁজে বিশেষ কোনো প্রয়াস ছাড়াই স্রষ্টার মনে ধরা দেয়। বড় জোর দু-

একটা মাত্রা ছোট বড় ক'রে তালে ভেড়াতে হয়। গীতিকারের পক্ষে এই স্বাভাবিক সৃজন-প্রক্রিয়ার বিপরীত পরিস্থিতি হল কোনো ছন্দকে প্রাথমিক শর্ত হিসাবে নির্দিষ্ট ক'রে ভাব, ভাষা, ছন্দ ও সুরের সুসংগঠিত সৌষ্ঠব নির্মাণ করা, তদুপরি সৃষ্টিকে রসোত্তীর্ণ ও আকর্ষণীয় করা। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে কবি নজরুল যত অবলীলায় দাদ্‌রা কার্ফা গজল চালের গান বেঁধেছেন, যত স্বচ্ছন্দ্যে প্রচলিত খেয়াল-ঠুংরির নিকটবর্তী ত্রিতালে নিবদ্ধ রাগপ্রধান গান বেঁধেছেন, যত স্বল্প আয়াসে ঐতিহ্যগত সংগীতশ্রেণীর প্রচলিত ঢং তুলে ধরেছেন, ততটা অনায়াসে সংস্কৃত ছন্দের অনুশাসনে গান বাঁধেননি। এগুলির জন্য অবশ্যই তাঁর মেধাবী অনুশীলন ও বৌদ্ধিক তৎপরতার প্রয়োজন হয়েছে। সুতরাং এই অভ্যাস-বিরোধী উপযোগ কবি নজরুলের সংগীত-সৃজন প্রতিভা বিচারের এক অতি বিচক্ষণ কষ্টিপাথর।

সংস্কৃত কাব্যছন্দ আমাদের এক মহৎ ও সুবৃহৎ উত্তরাধিকার। কাব্যভাষাকে শ্রুতিসুখকর ধ্বনি পরম্পরায় সজ্জিত করার সুরুচিবিলাস ঠিক কবে শুরু হয়েছিল বলা যায় না, কারণ সুদূর অতীত অনুপুঙ্খরূপে উদ্ধারযোগ্য হয়নি। তবে এইটুকু নিশ্চিন্তে বলা হয়ে থাকে যে বৈদিক যুগে গায়ত্রী, উষ্ণিক, বৃহতী, ত্রিষ্টুপ, জগতী, পংক্তি ইত্যাদি ২৬ প্রকার ছন্দ প্রচলনে ছিল। *রামায়ণে* পাওয়া যায় আরো কয়েকটি ছন্দ; যথা ইন্দ্রবজ্র, উপেন্দ্রবজ্র, প্রহর্ষিণী, রুচিরা, বসন্ততিলকং, পুষ্পিতাগ্রা ইত্যাদি। *মহাভারতে* দেখা যায় আরো নতুন নতুন ছন্দ-প্রমাণিকা, শালিনী, ভুজঙ্গপ্রয়াত, পঞ্চচামর, মালিনী, শার্দুলবিক্রীড়িতং প্রভৃতি। *ভাগবতে* আবির্ভূত আরো নতুন সংযোজন-স্বাগতা, মধুভাষিণী, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি। এরপর *শিশুপাল-বধ* এ দেখা যায় নতুনতর সংযোজন-মত্তময়ুর, জলধরমালা, পঞ্চকাবেরী, হারিণী প্রভৃতি। বিশেষজ্ঞরা বলেন, সংস্কৃত ছন্দের প্রকৃত সূক্ষ্ম-বিকাশ ও বহুবৈচিত্র্য আসে *রামায়ণ-মহাভারতের*ও পরে- কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ প্রমুখ সংস্কৃত মহাকবিদের প্রতিভাস্পর্শে।

সংস্কৃত ছন্দ সংখ্যায় অনেক হলেও এগুলির মৌলিক আদর্শ কিন্তু সংক্ষেপে বলা যায়। লঘু ও গুরু বর্ণের যথাযথ শব্দযোজনায় ধ্বনি-পরম্পরার এক একটি সুনির্দিষ্ট শৃংখলাপ্রবাহ এক একটি ছন্দের বিশেষত্ব। সংস্কৃত বর্ণমালায় অ, ই, উ, ঋ ও ৯ লঘুবর্ণ বা হ্রস্বধ্বনিসূচক। আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ঔ, ং, ঃ প্রভৃতি গুরুবর্ণ বা দীর্ঘধ্বনিসূচক। সংযুক্ত অক্ষর যেমন — ঙ্গ, প্র, থ্য, র্ণ ইত্যাদির আগে যেসব লঘুবর্ণ থাকে, সেগুলি গুরুরূপে উচ্চারত হয়ে (অঙ্গ, বিপ্র, কথ্য, বর্ণ-এখানে অ, বি, ক, ব দীর্ঘধ্বনিসূচক)। নির্দিষ্ট সংখ্যক অক্ষরের সমতা রক্ষায় হয় অক্ষরবৃত্ত ছন্দ, নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার সমতা রক্ষায় হয় মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে গান বাঁধার প্রয়োজনে মাত্রাবৃত্তে ব্যবহার করা হয় এই ছোট্ট সূত্র মেনে- প্রতিটি লঘুবর্ণ বা মুক্তদল ১ মাত্রা, প্রতিটি গুরুবর্ণ বা

রুদ্ধদল ২ মাত্রা। গানে ঝোঁক পড়ে প্রতি গুরুবর্ণের প্রথম মাত্রায়। প্রতি চরণে সমান সংখ্যক অক্ষর বা মাত্রায় সমবৃত্ত ছন্দ হয়।

বাংলা গানে সংস্কৃত ছন্দের প্রভাব সেই *চর্যাগীতি*র কাল থেকে সূচিত হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে তার সুমধুর অস্তিত্ব ছিল এবং একালেও তার রেশ নিশ্চিহ্ন হয়নি। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে লঘু-গুরু বর্ণের উপযুক্ত শব্দ-নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বাঁধা বিস্তর গান বাঙালীর সংস্কৃতচর্চার অপরিহার্য অঙ্গ-রবীন্দ্রনাথের জনগণমনঅধিনায়ক, দেশ দেশ নন্দিত কবি, সতিমির রজনী সচকিত সজনী, বাজে বাজে রম্যবীণা...; দ্বিজেন্দ্রলালের পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে, গিরি গোবর্ধন গোকুলচারী, নীলগগণ চন্দ্রকিরণ ...; রজনীকান্তের, ঐ ভৈরবে বাজিছে, ভারতকাব্যনিকুঞ্জে জাগ...; নজরুলের, দুর্গমগিরি কান্তারমরু... ইত্যাদি ইত্যাদি। গানের শ্রোতা সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের বিধানগুলি না জানতে পারেন, কিন্তু গানের ছন্দ-লীলায় অনায়াসে আকৃষ্ট হতে পারেন। সার্থক গানের ছন্দমাধুর্য উপভোগ একাধিক প্রজন্মে বিস্তৃত হয়েছে এইসব জনপ্রিয় গানের মধ্যে-গোবিন্দ্রচন্দ্র রায়ের কত কাল পরে বলে ভারতরে, দ্বিজন্দ্রলালের ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথের শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান প্রভৃতি। যাঁরা এইসব গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন তাঁদের শতকরা একভাগও জানেন না যে দ্বিজেন্দ্রলালের ওই গানটি নিখুঁত পজ্ঝটিকা ছন্দে বাঁধা, গোবিন্দচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের গান দুটি তোটক ছন্দে বাঁধা।

দিলীপকুমার রায় সংস্কৃত ছন্দে অনেকগুলি গান বেঁধেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলি হিট্ গান হয়ে লোকের মুখে মুখে ফেরেনি। তার মানেই সেগুলি অসার্থক বলা চলে না, হয়তো সেখানে শ্রোতার কিঞ্চিৎ পরিশীলিত শ্রুতির প্রয়োজন ছিল। শিল্পবিচারে অধিকার ভেদের প্রশ্নটি এইজন্যই এখনো ওঠে। স্যার উইলিয়ম জোন্‌স যে সংগীতকে একই সঙ্গে কলা ও জ্ঞানরূপে চিহ্নিত করেছিলেন তাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। জনপ্রিয়তাই উৎকর্ষের একমাত্র মাপকাঠি নয়।

সংস্কৃতে বেশ কিছু অক্ষরবৃত্ত ছন্দ আছে সেগুলি মাত্রাবৃত্তে সাজালে কোনো কোনো প্রচলিত তালের ভাঁজে মিলে যায়। যেমন পঞ্চচামর, তূণক, সমানিকা, প্রমাণিকা প্রভৃতি ছন্দের গানে ত্রিমাত্রিক তালের (দাদরা ইত্যাদি) ঠেকায় সংগত হতে পারে, যদিও তালের ঠেকার ধ্বনিবিন্যাস পূর্বোক্ত সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনি-পরম্পরার হুবহু প্রতিফলন নয়। ওই সূক্ষ্ম পার্থক্য শ্রোতার কানে চট্ করে ধরা না পড়তেও পারে কেননা সমের প্রস্বন ছাড়া তালের আর কোন্ কোন্ মাত্রায় গানে ঝোঁক পড়েবে তা নিয়ে শ্রোতার তেমন কোনো পূর্বপ্রত্যাশা থাকে না। ওই সূক্ষ্ম পার্থক্য বাদ দিলে বিদ্যুন্মালা, মত্তা, তোটক প্রভৃতি ছন্দ প্রচলিত চতুর্মাত্রিক তালে, বৃহতী প্রভৃতি ছন্দ চৌতালে, ভুজঙ্গপ্রয়াত প্রভৃতি ঝাঁপতালে,তনুমধ্যা প্রভৃতি সুরফাক্তায় এবং হরিগীতিকা প্রভৃতি তেওড়া তালে

ভিড়িয়ে দেওয়া যায়। আবার এমন সংস্কৃত ছন্দও আছে যাদের প্রচলিত তালে কোনোভাবেই ভেড়ানো যায় না, যেমন মন্দাক্রান্তা, শার্দুলবিক্রীড়িত, স্রগ্‌ধরা, বসন্ততিলক প্রভৃতি। এসব ক্ষেত্রে ছন্দ অনুযায়ী বোল উদ্ভাবন করা ছাড়া গতি নেই। এই বিষয়ের একটি অনুশীলনপর্ব ঘটেছিল কলকাতা বেতার কেন্দ্রে , চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে। তার অন্যতম অংশীদার ছিলেন সুরেন্দ্রলাল দাস, নলিনীকান্ত সরকার, কাজী নজরুল ইসলাম, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং সুরেন্দ্রলাল পরিচালিত যন্ত্রীসংঘ।

নলিনীকান্ত সরকার সশ্রদ্ধায় উল্লেখ করে গেছেন :

> সুরেন্দ্রলাল যেমন অভিজ্ঞ সংগীতে তেমনি পণ্ডিত সংস্কৃত ছন্দ শাস্ত্রে। অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত এরূপ বহু সংস্কৃত ছন্দকে তিনি সংস্কৃতের তালে পরিণত করেন। সেই সব সংস্কৃত ছন্দের তাল তিনি যন্ত্রীসংঘকে শিখিয়ে বেতার অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োগ করতেন। এই নতুন উদ্ভাবিত তালগুলির বোল রচনা করতেন তিনিই। ঐকতান সংগীতে, এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেন সুরেন্দ্রলাল দাস। রাগরাগিনীর যথাযথ রূপ বজায় রেখে পাশ্চাত্য পদ্ধতির রূপারোপ করে সমবেত যন্ত্রসংগীত রচনা আমাদের দেশে অভিনব প্রচেষ্টা। তাঁর এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তিনি কতকগুলি নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবনা করেছিলেন, যথা কোয়েলা, মন্ত্রবাহার, তারশানাই, ভ্রামরী, মেঘগদ প্রভৃতি[১]।

এই পর্বেই নজরুল ছন্দিতা অনুষ্ঠানের জন্য সংস্কৃত ছন্দে গানগুলি রচনা করেছিলেন। কবির ছন্দ নির্বাচন এমনই ছিল যে গানগুলি প্রচলিত তালের ঠেকার ছন্দ এড়িয়ে ভিন্ন রকম ছন্দের সৌষ্ঠবে শ্রোতাকে আকর্ষণ করে। ৭ মাত্রার ছন্দ হলেই সেটা তেওড়া বা রূপক ছন্দের অনুগামী নয়, ১৬ মাত্রায় ছন্দ হলেই সেটা ত্রিতাল, মধ্যমান বা আড়া ঠেকার চলনে চলবে না, ১৮ মাত্রার ছন্দ হলেই সেটা দাদরার ঢঙে চলবে না– এই সবই কবি গানের মাধ্যমে শ্রুতিগোচর করেছিলেন। কবির নির্বাচিত সবকটি ছন্দই ছিল অক্ষরবৃত্ত, ওগুলিকে মাত্রাবৃত্তে ব্যবহার করা পূর্বোক্ত সূত্রে–প্রতি লঘুবর্ণ বা হ্রস্বধ্বনি= ১ মাত্রা এবং প্রতি গুরুবর্ণ বা দীর্ঘধ্বনি অর্থাৎ= ২ মাত্রা, প্রস্বন দীর্ঘধ্বনির প্রথম মাত্রায়। সবকটিই ছিল সমবৃত্ত ছন্দ, হয়েছিল চরণে মাত্রাসংখ্যা সমান।

ছন্দের লক্ষণ সংক্ষেপে বোঝাবার জন্য গঙ্গাদাসের *ছন্দোমঞ্জরী*তে কয়েকটি সংকেত ব্যবহার করা হয়েছিল। '।' চিহ্ন–একটি লঘু অক্ষর এবং' 'ऽ' চিহ্ন একটি গুরু অক্ষর। কবি নজরুল অবশ্য '।' চিহ্নের পরিবর্তে,'না' লিখতেন এবং 'ऽ'এর পরিবর্তে 'তা' লিখতেন।

এক একটি সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনিবৈশিষ্ট্য নির্মিত হয় লঘু ও গুরু অক্ষরের পরম্পরা বিন্যাসে। এই বিন্যাস অতি সংক্ষেপে বোঝানো হয় তিন অক্ষরের এক একটি সমষ্টি 'গণ' (পর্ব) দিয়ে। ধ্বনিবৈচিত্র্য অনুসারে গণগুলির এক অক্ষরের নাম আছে, যথা :

S S S...	তিনটি অক্ষর গুরু	... ম গণ
1 1 1 ...	তিনটি অক্ষর লঘু	... ন গণ
S 1 1 ...	আদি অক্ষর গুরু পরের দুটি লঘু	... ভ গণ
1 S S ...	আদি লঘু পরের দুটি গুরু	... য গণ
1 S 1 ...	মধ্য গুরু পার্শ্ববর্তী লঘু	... জ গণ
S 1 S ...	মধ্য লঘু পার্শ্ববর্তী গুরু	... র গণ
1 1 S ...	অন্ত গুরু প্রথম দুটি লঘু	... স গণ
S S S ...	অন্ত লঘু প্রথম দুটি গুরু	... ত গণ

এছাড়া গ গণ–শুধু একটি গুরু অক্ষর এবং ল গণ–শুধু একটি লঘু অক্ষর।

এবার আমরা কবির সংস্কৃত ছন্দে বাঁধা গানগুলির ছন্দবৈশিষ্ট্য, মাত্রাসংখ্যার পর্ববিভাগ এবং কোন্ কোন্ মাত্রায় গানে ঝোঁক পড়ছে সবই পরিষ্কার বুঝতে পারব :

১। ছন্দের নাম প্রিয়া। অক্ষর সংখ্যা ৫ । ছন্দের সংখ্যা স ল গ অর্থাৎ

I	I	S	I	S
না	না	তা-	না	-তা

এতে লঘুবর্ণ= ৩, গুরুবর্ণ = ২, মাত্রাবৃত্তে মোট মাত্রাসংখ্যা = ৩ × ১+ ২ × ২ =৭

প্রস্বন তীব্র ৩ ও ৬ মাত্রায়। কবির গান মাত্রার পর্বে সাজালে :

		×			×	
১	২	৩	৪ ।	৫ ।	৬	৭
ম	হু	য়া	০ ।	ব ।	নে	০

২। ছন্দের নাম মধুমতী । অক্ষর সংখ্যা ৭ । ছন্দের লক্ষণ ন ন গ অর্থাৎ

।	।	।	।	।	।	S
না	না	না –	না	না	না –	তা

এতে লঘুবর্ণ–৬, গুরুবর্ণ,= ১, মাত্রাবৃত্তে মোট মাত্রা সংখ্যা = ৬ × ১ + ১ × ২ = ৮ । প্রস্বন তীব্র শুধু ৭ মাত্রায়। কবির গান মাত্রার পর্বে সাজালে :

								×	
১	২	৩	।	৪	৫	৬	।	৭	৮
ব	ন	কু	।	সু	ম	ত	।	নু	০

৩। ছন্দের নাম দীপকমালা । অক্ষর সংখ্যা ১০ । ছন্দের লক্ষণ ত ম জ গ অর্থাৎ

S । । S S S । S । S

তা না না –তা তা তা – না তা না –তা

এতে লঘুবর্ণ= ৪, গুরুবর্ণ=৬; মাত্রাবৃত্তে মোট মাত্রাসংখ্যা = ৪ × ১ + ৬× ২ =১৬ । প্রস্বন তীব্র ১, ৫, ৭, ৯, ১২ ও ১৫ মাত্রায়। কবির গান মাত্রার পর্বে :

×					×					×					×				×
১	২	৩	৪	।	৫	৬	৭	৮	৯	১০	।	১১	১২	১৩	১৪	।	১৫	১৬	
দী	০	প	ক	।	মা	০	লা	০	গাঁ	০	।	থ	গাঁ	০	থ	।	সই	০	

৪। ছন্দের নাম স্বাগতা । অক্ষর সংখ্যা ১১ । ছন্দের লক্ষণ র ন ভ গ গ অর্থাৎ

S । S । । । S । । S S

তা না তা – না না না – তা না না – তা– তা

এতে লঘুবর্ণ = ৬, গুরুবর্ণ=৫ ; মাত্রাবৃত্তে মোট মাত্রাসংখ্যা = ৬ × ১ + ৫ × ২= ১৬ । প্রস্বন তীব্র ১, ৪, ৯, ১৩ ও ১৫ মাত্রায় । মাত্রার পর্বে কবির গান :

×			×							×					×			×	
১	২	৩	৪	৫	।	৬	৭	৮	।	৯	১০	১১	১২	।	১৩	১৪	।	১৫	১৬
স্বা	০	গ	তা	০	।	ক	ন	ক	।	চ	ম্০	প	ক	।	ব	র্	০	।	না ০

৫। ছন্দের নাম মন্দাকিনী । অক্ষর সংখ্যা ১২। ছন্দের লক্ষণ ন ন র র অর্থাৎ

। । । । । । S । S S । S

না না না – না না না তা না তা –তা না তা

এতে লঘুবর্ণ= ৮, গুরুবর্ণ = ৪ ; মাত্রাবৃত্তে মোট মাত্রাসংখ্যা = ৮ × ১ + ৪ × ২= ১৬। প্রস্বন তীব্র ৭, ১০, ১২ ও ১৫ মাত্রায়। কবির গান মাত্রার পর্বে :

× × × ×
১ ২ ৩ । ৪ ৫ ৬ । ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ । ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
জ ল ছ । ল ছ ল । এ ০ স ম ন্ ০ । দা ০ কি নী ০

৬। ছন্দের নাম মণিমালা। অক্ষর সংখ্যা ১১। ছন্দের লক্ষণ ত য ত য

S S । । S S S S । । S S
তা তা না – না তা তা- তা তা না- না তা তা

এতে লঘুবর্ণ = ৪, গুরুবর্ণ = ৮; মাত্রাবৃত্তে মোট মাত্রাসংখ্যা = ৪ × ১+ ৮ × ২= ২০। প্রস্বন তীব্র ১,৩, ৭, ৯, ১১,১৩,১৭ ও ১৯ মাত্রায়। কবির গান পর্বে সাজালে :

× × × × × × × ×
১ ২ ৩ ৪ ৫। ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ । ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫। ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০
মন্ ০ জু ০ ম। ধু ছন্ ০দা ০ । নিত্ ০ তা ০ ত । ব সঙ্ ০ গী ০

৭। ছন্দের নাম রুচিরা। অক্ষর সংখ্যা ১৩। ছন্দের লক্ষণ জ ভ স জ গ অর্থাৎ

। S । S । । । । S । S । S
না তা না– তা না না– না না তা– না তা না – তা

এতে লঘুবর্ণ = ৮, গুরুবর্ণ = ৫; মাত্রাবৃত্তে মোট সংখ্যা =৮ × ১ + ৫ × ২ = ১৮। প্রস্বন তীব্র ২, ৫, ১১, ১৪ ও ১৭ মাত্রায়। কবির গান মাত্রার পর্বে সাজালে :

× × × × ×
১ ২ ৩ ৪ । ৫ ৬ ৭ ৮ । ৯ ১০ ১১ ১২ । ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ । ১৭ ১৮
ভ্র মর ০ নূ ।পুর ০ প রি । হি তা কৃষ্ ০ । ণ কুন্ ০ ত । লা ০

৮। ছন্দের নাম মঞ্জুভাষিণী। অক্ষর সংখ্যা ১৩ । ছন্দের লক্ষণ স জ স জ গ অর্থাৎ

। । S । S । । । S । S । S
না না তা– না তা না– না না তা– না তা না – তা

এতে লঘুবর্ণ = ৮, গুরুবর্ণ = ৫; মাত্রাবৃত্তে মোট মাত্রাসংখ্যা = ৮ × ১ + ৫ × ২ =১৮। প্রস্বন তীব্র ৩, ৬, ১১, ১৪ ও ১৭ মাত্রায়। কবির গান মাত্রার পর্বে সাজালে :

× × × × ×
১ ২ ৩ ৪ । ৫ ৬ ৭ ৮ । ৯ ১০ ১১ ১২ । ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ । ১৭ ১৮
আ জো ফাল্ ০ । শু নে ০ ব । কু ল কিঙ ০ । শু কে র ব । নে ০

৯। ছন্দের নাম মত্তময়ুর। অক্ষর সংখ্যা ১৩ । ছন্দের লক্ষণ ম ত য স গ অর্থাৎ

S S S S S । । S S । । S S
তা তা তা– তা তা না না– না তা –না না তা– তা

এতে লঘুবর্ণ = ৪, গুরুবর্ণ = ৯; মাত্রাবৃত্তে মোট মাত্রা সংখ্যা = ৪ × ১ + ৯ × ২ = ২২। প্রস্বন তীব্র ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১৩, ১৫, ১৯ ও ২১ মাত্রায় । কবির গান পর্বে সাজালে :

× × × × × × ×
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ । ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ । ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ।
মত্ ০ তো ম য়ু র ।ছন্ ০ দে ০ না । চে কৃষ্ ০ ণো ০

× ×
১৭ ১৮ ১৯ ২০ । ২১ ২২
প্রে মা নন্ ০ । দে ০

১০। ছন্দের নাম চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত। অক্ষর সংখ্যা ২৭। ছন্দের লক্ষণ প্রথমে দুটি ন গণ তৎপরে ৭টি র গণ অর্থাৎ

। । । । । । S । S S । S S । S S । S S । S S । S S । S.

এতে লঘুবর্ণ=১৩, গুরুবর্ণ=১৪, মাত্রাবৃত্তে মোট মাত্রা সংখ্যা= ১৩ × ১ + ১৪ × ২=৪১ । প্রস্বন তীব্র ৭, ১০, ১২, ১৫, ১৭, ২০, ২২, ২৫, ২৭, ৩০, ৩২, ৩৫, ৩৭ ও ৪০ মাত্রায়। কবির গান পর্বে সাজালে :

× × × ×
১ ২ ৩ । ৪ ৫ ৬ । ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ । ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ।
তা র কা । নূ পু রে । নীল্ ০ ন ভে ০ । ছন্ ০ দ শো ন্ ।

× × × × × ×
১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ । ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ । ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ।
ছন্ ০ দি তা র । সৃষ্ ০ টি ময় ০ । বৃষ্ ০ টি হয় ০ ।

×			×			×			×	
৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	।	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১
নৃত্	০	ত	সেই	০	।	নন্	০	দি	তা	র

প্রশ্ন জাগতে পারে, এত লম্বা ছন্দে নজরুল গান বাঁধলেন কেন ? অনুমান হয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের এই ছন্দের একটি কবিতা নজরুলের প্রেরণা হয়েছিল। সে কবিতাটি এই রকম :

গগনে গগনে নীল নিবিড়
ভিড় মেঘের ভিড় গো ভিড়
শোন্ তাদের শব্দ ভীম ডম্বরুর দুন্দুভির। [2] ... ইত্যাদি।

এখানে এই কথাটি উল্লেখযোগ্য যে গানের কাব্যভাষায় ছন্দের নিয়ম রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় লঘুবর্ণের স্থলে গুরুবর্ণ বা গুরুবর্ণের স্থলে লঘুবর্ণ এসে গেলে উচ্চারণে প্রস্বনের পার্থক্য ঘটিয়ে ছন্দ রক্ষা হবে। যেমন বনকুসুম তনু–এখানে সু লঘুবর্ণ কিন্তু গানের উচ্চারণে দীর্ঘধ্বনিসূচক। আজো ফাল্গুনে — এখানে আ এবং জো উচ্চারণে লঘুধ্বনিসূচক। এগুলি ছন্দপতন নয়, গান শুনলেই ছন্দের আদর্শরূপ শ্রুতিগোচর হবে।

আরেকটি কথা বলা কর্তব্য। *শেষ সওগাত* গ্রন্থে কয়েকটি মারাত্মক ছাপার ভুল ছিল। বা ছাপা যে কটি সংকেত ছিল সেগুলি ছাপার ভুলে আবির্ভূত। তাছাড়া চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত ছাপা হয়েছিল 'ছন্দবৃষ্টিপ্রপাত'রূপে, ৪১ মাত্রা ছাপা হয়েছিল ৪৮ মাত্রা রূপে। এইসব ছাপার ভুল সংশোধন ছাড়াই গ্রন্থে একাধিক পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।[3]

কবির পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা ব্লক করে *কাফেলা* পত্রিকায় (নজরুল সংখ্যা ১৩৮৯) ছাপানো হয়েছিল। তাতে দেখা যায় কবি আরো কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দের সূত্র খাতায় লিখেছিলেন, কথাকলহংস, কুসুমবিচিত্রা, মঞ্জুহাসিনী, জলধরমালা ও পঞ্চচামর। এই ছন্দগুলিতে কবি আদৌ গান বেঁধেছিলেন কিনা জানা যায় না।

ছন্দিতা অনুষ্ঠানে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী যে ভাষ্য দিয়েছিলেন এবং গানগুলির সাথে যন্ত্রীসংঘ যেসব *ঠেকা* বাজিয়েছিলেন তা উদ্ধার করা যায় নি। বলা বাহুল্য যে সেগুলি প্রচলিত তালের *ঠেকা* ছিলনা। সেগুলি না পাওয়া গেলেও অভিজ্ঞ তবলাবাদক এগুলির জন্য উপযুক্ত *ঠেকা* উদ্ভাবন করতে পারবেন। তাঁরা অবশ্যই জানেন যে অনেক সংস্কৃত ছন্দের বোল তাল বাজানো হয়ে আসছে বহুকাল ধরে, কিছু কিছু গ্রন্থেও তার নমুনা দাখিল করা আছে।

বর্তমান আলোচনায় নজরুল নির্বাচিত সংস্কৃত ছন্দগুলির প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক ধারণা উপস্থাপিত হল। কিন্তু ভাব, ভাষা, সুর ও ছন্দের সমন্বয়ে নির্মিত পূর্ণাঙ্গ সাংগীতিক সৌষ্ঠবের নান্দনিক সমীক্ষা স্থগিত রইল।

টীকা

১. প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, ১৩৯৮ ছিল সুরেন্দ্রলাল দাসের (১২৯৮–১৩৫০) জন্মশতবর্ষ।

২. আবদুল কাদির সাহেব তাঁর *ছন্দ সমীক্ষণ* গ্রন্থে এই কবিতাটির ছন্দ বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু প্রসঙ্গত নজরুলের ওই গানটির উল্লেখ থাকলে ভাল হত।

৩. অন্যের কথা ছেড়েই দিই, ছন্দবিশেষজ্ঞ আবদুল কাদির সাহেবও *নজরুল রচনাসম্ভারে* (৪) গানটি বিনা সংশোধনে ছাপিয়েছিলেন।